তাজউদ্দীন আহমদ : জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সিমিন হোসেন রিমি

প্রিয় বাবা,

আজ তোমার জন্মদিন। প্রতিটি নতুন বছরের প্রথম দিনে আমি ক্যালেন্ডারের পাতায় দেখে রাখি তোমার জন্মদিন আর চলে যাওয়ার দিনটিকে। যদিও আমি জানি এই দেখে রাখা আমার জন্য প্রতীকী একটি বিষয় মাত্র। কেননা, বীরের জন্ম একটিমাত্র দিনে সীমাবদ্ধ থাকে না। বীরের কীর্তি তাকে স্মরণের অমরতায় প্রতি মুহূর্তে নতুন করে জন্মলাভ করায় দেশে কালে জাতিতে মানুষে।

বাবা, তুমি এই বাংলাদেশ সৃষ্টির বিস্ময়কর এক কারিগর। ১৯৭১ সালে ধ্যানীর মতো সাধনায় পরিচালিত করেছ মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্তকে। কর্মযোগীর ভূমিকায় থেকে অসাধ্য সাধন করেছ দেশপ্রেমের মন্ত্র বুকে নিয়ে। তুমি এই ভূখণ্ডের মানুষের সঙ্গে মিশে থেকে, নিজ মাতৃভূমি মুক্ত করার সংগ্রাম শেষে তাদেরই হাতে তুলে দিয়েছ স্বাধীন একটি পতাকা।

বাবা, তুমি অবিস্মরণীয় অনন্য একটি অধ্যায়।

ছোটবেলায় তুমি ছিলে আমার স্বপ্নের রাজপুত্র। তারপর বিজয়ী বীর। তারপর যত দিন গেছে, বুঝতে পেরেছি তুমি আসলে একা কারও নও। তুমি সবার। তোমার এই পরিচয়ই আমার কাছে চিরসত্য। এই বাংলাদেশের সব মানুষকে মনে হয় তোমার সন্তান, যাদের জন্য আত্মমর্যাদাশীল দেশ গড়ার সাধ ছিল তোমার। তোমার সেই ইচ্ছার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে এই দেশের প্রতিটি মানুষ। এমনকি আজ যে শিশুটি জন্ম নেবে সেও। আসলে দায়িত্ব তো বর্তায় মানুষের ওপরেই। ভিন দেশ থেকে অথবা অজানা কোনো গ্রহ-নক্ষত্রের অতিবুদ্ধিমান কোনো প্রাণী এসে এই একবিংশ শতাব্দীতে দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে যেতে পারে, এই ভাবনা দীনতারই পরিচয় বহন করে। ধনের দারিদ্র্যের চেয়ে মনের দারিদ্র্য সর্বনাশ করে সীমাহীন।

বাবা, প্রতিদিন সকালে আমি যখন খবরের কাগজ পড়ি, তখন তোমার কথা খুব মনে হয়। কেন মনে হয় জানো? তুমি বলতে, সংবাদপত্র জনমতের প্রতিনিধি। আর রাজনীতিবিদরা জনগণের। তোমার কথা মনে করে আমি কী ভাবি জানো? খবরের কাগজের সূত্র ধরেই যদি এক-এক করে সমস্যাকে চিহ্নিত করা যায়, তবে সমাধানের এক না এক পথ বের হয়েই যায়। দায়িত্বশীল পদের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের মানুষেরা দায়িত্ব এড়াতে, নিজের অক্ষমতাকে ঢাকতে শুধু বলতে থাকেন, সংবাদপত্র বড় বেশি নেতিবাচক কথা ছাপে। অথচ তুমি বলতে, সমস্যার কথা তুলে ধরার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই; বরং এতে সত্যিকার অবস্থা জানা সম্ভব হয়। সংবাদপত্রের কাছে তোমার আহ্বান ছিল, বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টির পথে সরকারের যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তা দেখিয়ে দেওয়ার। তুমি বলতে, সরকার যদি কোনো ভুল করে, তবে সংবাদপত্রগুলো তার সমালোচনা করুক। সরকারের ভুল-ত্রুটি জনগণের সামনে ঠিকমতো তুলে ধরা না হলে জনগণ তো জানতেও পারবে না সরকার কী করছে। জনগণের সরকার যদি ভুল করে, তবে জনগণের মতামত এবং সহযোগিতাতেই তার ভুল শুধরে নেবে। বাবা, তোমার আন্তরিক একটি চেষ্টাই ছিল সততা, স্বচ্ছতা এবং শুদ্ধতার প্রতি, আজ যা তাঁবেদারির ডামাডোলে মাথা উঁচু করতে ভুলেই গেছে!

তুমি বলতে, আমরা সামন্তবাদী অবস্থা ও পরিবেশ থেকে এখনো পূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থায় পৌঁছতে পারিনি। সামন্ত প্রভু আজ নেই সত্য, কিন্তু সামন্ত মনোবৃত্তি এখনো রয়েছে। এই মানসিকতা আগে পরিবর্তন করতে হবে। তুমি চাইতে, জনগণ যেন তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। আর জনগণকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। অথচ এখন আমাদের দেশে যা হচ্ছে তা 'হীরক রাজার দেশের' মতোই ঘটনা। জনগণ যত কম জানে তত বেশি মানে ধরনের ফর্মুলায় ফেলা হয়েছে জনগোষ্ঠীকে।

তোমার বিশ্বাস ছিল, সন্তানের পিতাই কেবল একক পিতৃত্বের দাবিদার হতে পারেন না। একটি শিশুকে যিনি প্রাথমিক জ্ঞান এবং শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলেন, তার দান কোনো অংশেই কম নয়। বলেছিলে, সমাজের ভিত্তি গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকাই মুখ্য। তুমি বলেছিলে, দেশে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের আর্থিক অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি, অভাব-অনটন আজও তাদের নিত্যসঙ্গী। যিনি মানুষ গড়বেন, আলোকিত করবেন মানবজীবনকে, তার ঘরেই শূন্য প্রদীপ! এর চেয়ে বড় পরিহাস আরও কি হয়?

তুমি বলেছিলে, দেশে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন। কেবল সাধারণ শিক্ষার ফলে সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। আরও বলেছিলে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে শিক্ষার সুযোগ না দেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সুবিধাভোগী শ্রেণী এই সুযোগ গ্রহণ করতেই থাকবে। তাই চেয়েছিলে সাধারণ মানুষের যেন উন্নতি হয় সেই রকম একটি জনকল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে। বলেছিলে নতুন সমাজ গড়তে পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা, যেখানে দেশের অগ্রগতির জন্য সর্বস্তরে সব রকম কর্মী মানুষ পাওয়া যাবে। কোনো দিক শূন্য থাকবে না। চেয়েছিলে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থার শিক্ষা পদ্ধতির বৈষম্য দূর করতে, কিন্তু আমরা কী দেখছি, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যই শুধু বাড়েনি, তিন পদ্ধতির শিক্ষার গোঁজামিলে যা হচ্ছে

তা ভেঙে ফেলার মতো সাহসী মানুষের বড়ই অভাব!

কী আশ্চর্য নির্ভুল বুঝতে পারার ক্ষমতা ছিল তোমার। তুমি প্রায়ই বলতে, দেশ যে দিকে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ করার অপরাধে হয়তো একদিন রাজাকাররা আমাদের ঘর থেকে টেনে বের করবে। বাবা! আমরা কি তেমনি কোনো সময় অতিক্রম করছি? না হয়, '৭১-এ পরাজিত পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের পদলেহনকারী এই দেশের মানুষ হত্যাকারী জামায়াতে ইসলামী এবং তাদেরই মতো সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মব্যবসায়ী অন্য দলগুলো কী করে ক্ষমতার শীর্ষে যায়? কী করে তারা এই যুদ্ধজয়ী দেশে রাজনীতি করার সুযোগ পায়?

আমরা কী করে ভুলি বাবা, ধর্মের নামে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, বিবেকের কণ্ঠ রোধ করে হত্যার চেষ্টা চলেছে দীর্ঘ বছর? কী করে ভুলি বাবা, শত্রুসেনাদের সঙ্গে মিশে এই লোকগুলো নির্বিচারে মানুষ হত্যা করেছে একাত্তরে? ভোলা কি যায় মা-বোনের ওপর পাশবিক অত্যাচারের কথা? পরাজয় নিশ্চিত জেনে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা কী ভোলা সম্ভব? চোখ উপড়ে, হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে, শরীরটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা!

বাবা, তুমি ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সদ্যমুক্ত যশোরের মাটি থেকে ঘোষণা করেছিলে, আজ থেকে ধর্মের ওপর ভিত্তি করে এই দেশে কোনো রাজনৈতিক দল থাকবে না। তুমি বলেছিলে, অর্থনৈতিক ও গঠনমূলক কর্মসূচির ওপর ভিত্তিশীল রাজনৈতিক দলগুলোকেই শুধু এখানে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে (যা পরে বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজিত হয়), তুমি বলেছিলে, বাংলাদেশ হবে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বাংলাদেশে প্রতিটি ধর্মের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্মের নামে কাউকে শোষণ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমরা কী দেখলাম? '৭৫-পরবর্তী সময়ে অসাংবিধানিক উপায়ে সংবিধানের ওপর কাঁচি চালানো হলো। সংবিধানকে অজ্ঞাতসারে ক্ষতবিক্ষত করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে ধর্মব্যবসায়ী দলগুলোকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া হলো।

বাবা, তুমি তো শুরু থেকেই বলেছিলে, যারা শত্রু-সৈন্যদের ইচ্ছাকৃতভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। শত্রুর সাহায্য ও দালালি যারা করেছে আইনের মাধ্যমেই তাদের বিচার হবে এবং অপরাধীকে অবশ্যই সাজা ভোগ করতে হবে। বলেছিলে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে '৭১-এর নয় মাসে যেসব যুদ্ধবন্দী গণহত্যা ও অন্য অপরাধের জন্য দায়ী হবে, তাদের বিচার করা হবে।

১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেটস, উইলিয়াম রজার্স, যখন নাইজেরিয়া বায়াফ্রার যুদ্ধ-অপরাধীদের মাফ করে দিয়েছে—এই উদাহরণ টেনে বাংলাদেশের যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উল্লেখ করে বাংলাদেশকে নমনীয় হতে অনুরোধ করেন, তখন তুমি তার বক্তব্য খণ্ডন করেছিলে এই বলে যে, বায়াফ্রায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ফেডারেশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে কিন্তু সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হরণে পাশবিক অত্যাচার করে পরাস্ত হয়। এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু ছিল ক্ষমতাশালী এবং তারা যে অপরাধ করেছে তার বীভৎস বিবরণ খোদ আমেরিকার সাংবাদিকরাও লিপিবদ্ধ করেছেন। তবুও বাংলাদেশ সব সেনাবাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১৯৫ জনের বিচার দাবি করেছে। এই বিচার মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয়।

বাবা, তুমি বলেছিলে, জনগণের সামনে সব সময় বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে, যেন ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলো জনগণের না জানার সুযোগকে পুঁজি করে এগিয়ে আসতে না পারে। তুমি ঐক্যবদ্ধ সমাজের কথা বলতে, কিন্তু যাদের দায়িত্ব ছিল মানুষকে সচেতন করার, তারা তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের এই ব্যর্থতার ফলেই সমাজ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। আরও কী মনে হয় জানো বাবা, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আধুনিক এবং দেশ-উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। ঔপনিবেশিক কায়দার আচরণ এখনো আমাদের মজ্জাগত। আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি উপনিবেশের সময় যে দাবিগুলো আমাদের ছিল এ বং যে কারণে আমরা সার্বিক অগ্রগতির মুখ দেখতে পাইনি, বর্তমানে সেগুলো পূরণের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের ওপর বর্তেছে। কিছুদিন, কিছু বছর এক দল অন্য দলের প্রতি দোষারোপ করতে পারে। কিন্তু তারপর? আকাশ থেকে তো কোনো শুভ নক্ষত্র এসে আমাদের উদ্ধার করে দিয়ে যাবে না।

বাবা, আজ তোমাকে চিঠি লিখতে বসে তোমার মনের ভাবনাগুলোই নতুন করে তোমাকে লিখছি। কেন লিখছি জানো, মনে-প্রাণে চাই তোমার মতো দেশপ্রেমিক নিষ্কলুষ কিছু মানুষকে এই সমাজ ধারণ করুক। ওই যে তুমি বলেছিলে, দেশে বিবেকের সংকট দেখা দিয়েছে। এবং একমাত্র দেশের যুব সমাজের নিষ্কলুষ মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নেতৃত্বের মাধ্যমে তাই সংকট কাটানো যেতে পারে।

তরুণদের নিয়ে তোমার ভাবনার কোনো অন্ত ছিল না। তুমি বলতে, যুবকদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে মন ও মননশীলতার বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে, পাঠাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়াতে হবে, খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রদের শিক্ষায়তনের বাইরে খেলাধুলা ও পড়াশোনার সুযোগ নেই বলে তরুণ সমাজ বিপথে যাচ্ছে। জাতি ও সমাজ গঠনে তরুণ সমাজকে নিয়োজিত করতে হলে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করে তাদের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, নিষ্কলুষ আনন্দ লাভের সুযোগ করে

দিতে হবে, আর না হয় এরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, আনুষঙ্গিক দোষে দোষী হবে। এর ফলে হাত শুধু পকেটেই যাবে না, নানা দিকে যাবে।

পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে তুমি কী বলেছিলে জানো? বলেছিলে, পুলিশ হলো মৌলিক প্রতিষ্ঠান। আইন ভঙ্গ হলে মানুষ পুলিশের কাছে যায়। কাজেই সেই পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা জন্মাতে হবে। এ আস্থা জন্মানোর দুটো উপায় আছে—এক. পুলিশ প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজানো। এই কাজটি এক দিনে করা সম্ভব হবে না। বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। কিন্তু কাজটি শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেছিলে, সবাইকে নিজ নিজ ঘর থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে হবে। না হয় দুর্নীতি উচ্ছেদ হবে না এবং বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি কখনো যাবে না। ওপর থেকে আদর্শ অনুশাসন করে দেখাতে হবে, তাহলে কর্মীরা উৎসাহ ও প্রেরণা পাবে। ওপরে বসে দুর্নীতি করে আদর্শবান নাগরিক হওয়ার উপদেশ দেওয়া উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এর ফলে জাতির দুর্ভোগ কমবে না বরং বাড়বে।

বাবা, তুমি বলেছিলে, শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই মানুষের দুঃখ-কষ্টের অবসান হয় না। এ জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া নির্ভর করে নির্ভুল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ওপর।

বাবা জানো, তোমাকে জানার আকাঙ্ক্ষায়, তোমার দৃষ্টিকে ছুঁয়ে দেশটাকে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টায় আমরা বুঝেছি, রাজনৈতিক দলের এবং নেতৃত্বের যদি পরিকল্পনা, আন্তরিকতা, চেষ্টা, সততা, ভালোবাসা এবং সাহস না থাকে, তবে দেশ কখনোই জনগণের দেশ হয়ে উঠতে পারে না। রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবেই। প্রতিযোগিতা থাকবে জনগণের চাহিদা পূরণে কোন দল কত বেশি কার্যকর পরিকল্পনার ভিত্তিতে কর্মসূচি দিতে পারে এবং তা বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করতে পারে, সেই জায়গায়। ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ি এবং ওমুক দল ক্ষমতায় থাকার সময় কিছুই করেনি ধরনের কথাবার্তা উন্নয়নে কোনো ধরনের ভূমিকা তো রাখেই না, বরং সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ও নিচতা বাড়ায়। সমাজ আজ ঐক্যবদ্ধ তো নয়ই, ন্যূনতম চক্ষুলজ্জাহীনভাবে বিভক্ত, যা আমরা সাধারণ মানুষেরা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এই বিভক্তি আদর্শের জন্য নয়, নীতির প্রশ্নে নয়। ক্ষমতায় আরোহণের জন্য, ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে সুবিধা ভোগের জন্য।

বাবা, আমি লজ্জাবোধ করি, যখন দেখি শিক্ষকেরা লাল-সাদা-নীল নানা রঙে বিভক্ত। আমি মুষড়ে পড়ি, যখন দেখি মহান ব্রতের অধিকারী চিকিৎসক সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। কোথায় নেই বিভক্তি। গ্রামের মানুষে মানুষে শুধু রাজনৈতিক ভাবনায় আগের সেই সম্প্রীতি আজ কমে গেছে।

প্রিয় বাবা, তুমি বিরক্ত হবে না এই ভরসাতেই আমি আজ অন্য কোনো দিনে নয়, তোমার জন্মদিনেই বহু কথা বলছি। তুমি এক বিজয় দিবসে বলেছিলে, আজ আমাদের আত্মসমালোচনারও দিবস। যে জাতি আত্মসমালোচনা করে না, সে জাতি কখনোই অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। সরকারের মিথ্যা সাফাই গাওয়া নয়, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরিয়ে দিয়ে দেশ গড়ার কাজে গঠনমূলক দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের কোটি কোটি ভুখা-নাঙ্গা মানুষের পেটে ক্ষুধা রেখে গুটিকয়েক সুবিধাবাদী শ্রেণীর জন্য এই স্বাধীনতা আসেনি।

বাবা, তোমার মতো বিশ্বস্ততার সঙ্গে কেউ তো সরকারি কর্মচারীদের বলতে পারে না, আইনগতভাবে এবং দেশপ্রেমের মনোভাব নিয়ে কর্তব্যরত প্রতিটি সরকারি কর্মচারীকে সরকার বাইরের চাপ ও ভীতি প্রদর্শন থেকে রক্ষা করবে। তাই তারা যেন কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার না করেন।

তুমি ঠিকই বলেছিলে, বলপ্রয়োগ করে কোনো দিনও ভালো কাজ আদায় করা সম্ভব নয়। বলপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অসাধুতাও জেঁকে বসে।

বাবা, তুমি তো এক সময়ে তোমার দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলে। কিন্তু যখন সরকারি দায়িত্বে গেলে অর্থাৎ মন্ত্রিসভার অন্তর্ভুক্ত হলে, তখন তোমার দলীয় দায়িত্বের পদটি ছেড়ে দিলে। তুমি বললে, একজন মন্ত্রীর পক্ষে দলীয় কর্মকর্তার পদে বহাল থাকা উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি যদি একই সঙ্গে সরকার এবং দলের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে দলে রাজনৈতিক ভারসাম্যের ক্ষতি এবং শাসনকাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

বাবা, সত্যি বলি, তুমি যদি এই দেশে জন্ম না নিতে তাহলেই বোধহয় ভালো হতো। কারণ, তোমার মতো গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী, উদারমনা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সততায় ভরপুর, দেশের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বিশ্বস্ত পূর্ণাঙ্গ মানুষকে তো এই দেশ খুন করে ফেলে বাবা। বাবা, তুমি কষ্ট পেয়ো না। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। আমরা জানি, তোমার দেশপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। তুমি এই দেশে জন্ম নিয়েছ বলে নিজেকে ধন্য মনে করেছ। আমরা ভুলিনি তুমি বলতে, ৫০, ১০০ কি তারও বেশি বছর পরে এই দেশের মানুষ যদি বুঝতে পারে এই দেশকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবেসে তুমি তাদের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলে, তাহলেই তোমার সার্থকতা, তোমার রাজনীতির সার্থকতা। তুমি কত সহজে বলতে, মুছে যাক আমার নাম, তবু বেঁচে থাক বাংলাদেশ।

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর সেদিনের তরুণ তুমি তোমার ডায়েরিতে লিখেছিলে, সূর্য অস্তমিত হলো এবং অস্তমিত হলো মানবতার পথের দিশারি আলোকবর্তিকা। তাহলে কি অন্ধকার নেমে এল! আলো এবং অন্ধকার, অন্ধকার এবং আলো। দিনের পরে তো রাত্রির আগমন এবং দিনের আগমনে নিশাচর অপসারণ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তারপরে তো সূর্যের কিরণ। ক্ষীণতনু নতুন চন্দ্র। কিন্তু তারপরে তো আনন্দময় পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব।

হতাশার শেষ তো আশাতে। সংকটময় মুহূর্ত তো তিরোহিত হয় বিস্মৃত অতীতে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়। জগৎ তো থেমে থাকে না। অনির্বার তার এই চক্র।

যে মানুষটির শোকে আজ আমরা মুহ্যমান, সে মানুষটি তো অন্ধকারের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছেছিলেন। তাকেও তো অন্ধকারে আলোর অন্বেষণে উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। অথচ কি বিস্ময়! তিনি নিজেই তো ছিলেন একটি আলোকবর্তিকা।

আলোককে কি তুমি ধ্বংস করতে পারো? আলোর কণিকা আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে অবস্থিত হতে পারে। কিন্তু তাতে কী? ধ্রুবতারার দূরত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু বিজন মেরুতে অভিযানকারীর সেই তো একমাত্র দিকনির্ধারক। যুগ থেকে যুগে। তার প্রতিটি ক্ষুদ্র কম্পনও আমাদের পথে দিশা প্রদান করে। তাহলে বেদনা কেন? বহু যুগের এই ধ্রুব তারার কাছ থেকে আমরা নির্দেশ গ্রহণ করব। তার ফেলে যাওয়া পায়ের চিহ্ন ধরে আমরা অগ্রসর হব। তিনি শান্তি লাভ করুন। আমিন।

প্রিয় বাবা, তোমার অজস্র ভাবনার সামান্য অংশের অতুলনীয় কিছু সৌরভ ছড়িয়ে দিলাম তোমার জন্মদিনে। যদি এই সৌরভ পৌঁছে যায় কোনো হৃদয়ে...।

অফুরন্ত ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা রইল তোমার জন্য।

—তোমার দেশ মায়ের কোটি সন্তানের একজন

বি. দ্রষ্টব্য : *চিঠিতে ব্যবহৃত তথ্যের সূত্র গ্রন্থ : 'তাজউদ্দীন আহমদ : ইতিহাসের পাতা থেকে' এবং 'তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা।'*

সিমিন হোসেন রিমি : তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা।

simrim_71@hotmail.com

রাজধানীর অদূরে